সিনেমায় মব ট্রায়াল : হাইপাররিয়েলিটি, অপরাধ ও বিনোদন

উম্মে রায়হানা

চলচ্চিত্রের কাজ কী কী? বিনোদন দিয়ে দর্শককে রোজকার যাপিত জীবন থেকে এক চিলতে মুক্তিই কি কেবল সিনেমার কাজ? না, সিনেমা বহুরকম, ফিকশন যেমন একটা জঁরা তেমনই আছে ডকুমেন্টারি, ডকুফিকশন, বায়োপিক এমন আরো অনেক রকমের ছায়াছবি। সকল প্রকার গণমাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রের শক্তি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। তবে চলচ্চিত্রের মধ্যে আবার ফিকশনই জঁরা হিসাবে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

হালে একটি বাংলা সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় হওয়ার কারণ সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে নানা সংগত কারণে। যে সিনেমাটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তার নাম পরান (২০২২), পরিচালক রায়হান রাফি। এই ছবির প্রথম টিজারে 'বেইজড অন ট্রু ইভেন্ট' দাবি করা হলেও সিনেমার শুরুতে বলা হয় 'সকল চরিত্র কাল্পনিক'। ফলে, বিষয়টা একটু সন্দেহজনক। সে যা-ই হোক, এই ছবি স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় টানা হলে চলেছে। এর কাছাকাছি হয়ত অনেক ছবিই চলে কিন্তু এই ছবি অত্যন্ত প্রশংসাও পেয়েছে। পুরস্কার নয়, প্রশংসা। অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির খবরও হয়ত আমরা রাখি না, কিন্তু এই ছবির কথা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। একই সঙ্গে ব্যবসাসফল হওয়া এবং প্রায় সব মহলের প্রশংসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

কী আছে এই ছবিতে আর কেন আমি এই তুমুল জনপ্রিয়তাকে ভয় পাচ্ছি! এই ছবির ক্লেইম আর ডিসক্লেইমার নিয়েই বা আমার এত মাথাব্যথা কেন! এই জন্য যে, কেউ বলে না দিলেও, পরিচালক ও প্রযোজক পক্ষ স্বীকার/অস্বীকার করলেও কিছুই বদলায় না; সকলেই জানে এই ছবির গল্প বাস্তব চরিত্র রিফাত, মিন্নি এবং নয়ন বন্ড-এর জীবনের কাহিনি অবলম্বনে লেখা। গল্পের প্রয়োজনে সামান্য এদিক ওদিক থাকলেও এটা ভীষণ স্পষ্ট। এই ছবির কর্তৃপক্ষ এই তিনজনের পরিবারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন কি না এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

রিফাত, মিন্নি ও নয়ন বন্ড বাস্তব চরিত্র হলেও এই লেখায় তাদের নিয়ে আলোচনা করতে হবে। রিফাত হত্যা মামলায় ২০১৯ সালে মিন্নিসহ আরো পাঁচজনের ফাঁসির হুকুম হয়। রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামিরা ছিলেন– রাকিবুল হাসান রিফাত ফরাজি, আল কাইউম ওরফে রাব্বি আকন, মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত, রেজওয়ান আলী খান হৃদয় ওরফে টিকটক হৃদয়, মো. হাসান, মো. মুসা, আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি, রাফিউল ইসলাম রাব্বি, মো. সাগর এবং কামরুল ইসলাম সাইমুন।

বরগুনায় এই হত্যা মামলার মূল কারণ এক কথায় বলতে গেলে সেক্সুয়াল জেলাসি। তদন্তে পাওয়া যায়, নয়ন বন্ডের সঙ্গে আগে বিয়ে হয়ে থাকলেও সেই বিয়ে তালাক না করেই রিফাতকে বিয়ে করেন মিন্নি। রিফাতের সঙ্গে বিবাহিত অবস্থায় নয়নের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তার। এক সময় প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নয়ন প্রকাশ্য দিবালোকে রিফাতকে কুপিয়ে হত্যা করেন। সে সময় মিন্নি রিফাতের সঙ্গে ছিলেন। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও রয়েছে, কিন্তু তদন্তে মামলার মোড় ঘুরে মিন্নি সাক্ষী থেকে আসামিতে রূপান্তরিত হন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই হত্যাকাণ্ডে মিন্নির ইন্ধন বা প্ররোচনা ছিল বলেই মনে করা হয়।

যা বলছিলাম, পরান ছবির জনপ্রিয়তার কথা। এই ছবির জনপ্রিয়তার কারণ ওই বাস্তবের চরিত্ররা। খবরের কাগজসহ নানা মিডিয়ার কল্যাণে লোকে এই চরিত্রদের চেনে। ঘটনাটা ছিল সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যকর। এই সময় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কিশোর গ্যাং বিষয়টি দেশের মানুষের সামনে আসে। কিশোর গ্যাং হচ্ছে অল্পবয়সী অপরাধী, মূলত মাদক সেবন ও ব্যবসার একটি চক্র। এই চক্র নানা জেলা ও উপজেলায় আছে, যেমন আছে রাজধানীর মিরপুরে। ইন্টারনেট বা স্মার্টফোনে যোগাযোগ করে তারা মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধমূলক কার্যক্রম চালায়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, এই হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক আসামির কথা বলা হয়েছে সংবাদে। যাদের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়াও আরো দশজন অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিও ছিলেন, যাদের চার্জশিট শিশু আদালতে গঠন করা হয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে তাদের নাম প্রকাশ করা হয় নি।

পরান সিনেমা মূলত এই ঘটনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়। বেইজড অন ট্রু স্টোরি বা সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা তৈরির চর্চা বহু পুরানো। হলিউডে এমন অনেক সিনেমা আছে। কিন্তু ওই যে শুরুতেই বললাম, এই সিনেমার ক্ষেত্রে এই তথ্যটি দর্শককে স্পষ্ট করে দেওয়া

হয় নি। যদিও তাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ দর্শক এই জেনেই হলে গিয়েছেন যে ছবিটা এই তিনজন নারী-পুরুষের ত্রিভুজ প্রেমের ভিত্তিতে বানানো।

আমি নিজেও এই ছবিটা দেখতে গিয়েছি এই আগ্রহ থেকেই। আমার মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত ছবিতে মিন্নিকে ডিমোনাইজ করা হবে না, হয়ত গল্পটাকে মানবিক করে দেখানো হবে! সব চরিত্রের দৃষ্টিকোণ উঠে আসবে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সেটাই, যেখানে কেউ হিরো কেউ ভিলেইন হয় না, সিনেমায় বিষয়টা উলটো। সিনেমায় অভিনেতারাও হয়ে ওঠেন হিরো বা ভিলেইন। কোনো কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী খল চরিত্রে অভিনয় করতে করতে সেই হিসেবেই পরিচিত হয়ে যান। যেমন আহম্মদ শরীফ বা মিশা সওদাগর ভিলেইন, মান্না বা ইলিয়াস কাঞ্চন হিরো, চম্পা বা ববিতা হিরোইন, রওশন জামিল বা রিনা খান ভ্যাম্প– এই রকম।

সে যা-ই হোক। আমি এই সিনেমা সম্পর্কে যে মন্তব্য শুনলাম তা হচ্ছে, পরান ছবিতে নায়িকাই ভিলেইন। প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কিছু শব্দ ইংরেজি শব্দ দিয়েই স্পষ্ট হয়; যেমন, যে বলেছে এই ছবিতে নায়িকাই ভিলেইন, সে কিন্তু বলে নি নায়িকাই ভ্যাম্প। ভ্যাম্প বা ভ্যাম্পগার্ল বলে সিনেমার যে টার্ম, তাতে এমন সব নারী চরিত্র বোঝায় যারা কিনা ভিলেইনের আশেপাশে থাকেন, হলিউডের কনটেক্সটে ভিলেইনের শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু পরানে হিরোইন স্বয়ং ভিলেইন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ছবিতে আরো একজন ভিলেইন আছেন, তিনিও নারী।

ছবিটার মেকিং সম্পর্কে কথা বলতে গেলে এ কথা বলতেই হবে, এক কথায় চমৎকার! পিকচারাইজেশন থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্টিং, পুরোটায়ই মুন্সিয়ানা আছে। ঘটনাক্রমে এই ছবির শুটিং হয়েছে ময়মনসিংহে। নিজের শহর বড়পর্দায় দেখার একটা আনন্দ আছে। এই ছবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের ক্যাম্পাসের সুন্দর সুন্দর লোকেশন দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে দেখানো হয়েছে পৌরুষ এবং পুরুষালি সৌন্দর্য।

তাত্ত্বিকদের বেশিরভাগ চিন্তাভাবনা পর্দায় নারীদেহ প্রদর্শন ও উপস্থাপন নিয়ে হলেও ম্যাসকুলিনিটি বা পৌরুষের নির্মাণ ও প্রদর্শনী নিয়েও রয়েছে বিস্তর আলোচনা। পরান ছবিতে মূলত দুই ধরনের পৌরুষ নির্মাণ করা হয়েছে, নারীত্ব বা ফেমিনিটি নির্মাণ করার সময় সাবধানে লেপে দেওয়া হয়েছে নারীবিদ্বেষ। এই নারীবিদ্বেষের ধরন খুবই সাটল,

সাদা চোখে দেখা যায় না এমন। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে রওশন জামিল যেমন ভিলেইন, তেমনটা নয়। এই ছবিতে রওশন জামিলের চরিত্রটা ছিল মেটাফরিক। পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের প্রতীক হয়ে আসে পরিবারের বড় বোনের চরিত্র। কিন্তু পরান ছবিতে মেটাফর নয়, সরাসরিই নারী চরিত্রগুলোকে বোকা, লোভী ও খল করে দেখানো হয়েছে।

এইখানে যারা ছবিটা দেখেন নি তাদের জন্য গল্পটার প্লটলাইন ও ক্যারেক্টার কনস্ট্রাকশন বিশদে বলা প্রয়োজন। ছবির শুরু হয় নারী প্রোটাগনিস্ট অনন্যার আত্মহত্যা চেষ্টার মধ্য দিয়ে। অনন্যা প্রধান চরিত্র হলেও কিন্তু নাম ভূমিকায় রয়েছেন নায়ক রোমান, যাকে নায়িকা অনন্যা আদর করে 'পরান' বলে ডাকে। অনন্যার আত্মহত্যা চেষ্টার পর বাবা-মা ও বোন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে এক পুলিশ অফিসার আসেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে। সুস্থ হয়ে অনন্যা থানায় যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে কাহিনি এগোতে থাকে। ফ্ল্যাশব্যাক সিনেমার ভাষায় বেশ পুরানো পদ্ধতি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এই ছবিতে পরিচালক কোথাও সিনেমার বাঁধাধরা পদ্ধতি বা ফর্মুলার বাইরে যান নি, ফলে ছবি উপভোগ্য হয়েছে; যেমন, অনন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কর্কশ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে এমন কিছু সংলাপ বলানো হয়েছে যা দর্শককে হাসিয়ে কমিক রিলিফ দিয়েছে।

অনন্যার পুলিশকে দেওয়া জবানিতেই ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, অনন্যা অত্যন্ত খারাপ ছাত্রী, কয়েকবার চেষ্টা করেও এইচএসসি পাস করতে পারছে না, এর মধ্যে রোমান নামের এলাকার মাস্তান তাকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। বাসায় এ কথা জানালে বাবা ভাবেন মেয়ে ফাঁকিবাজি করতে, কলেজে না যাওয়ার উছিলা হিসেবে গল্প বানাচ্ছে। এক সময় অনন্যা রোমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পরীক্ষায় নকল করে পাস করে। অনন্যার এই বন্ধুত্বকে নিখাদ বন্ধুত্ব বলা চলে না। সে আদর করে রোমানকে 'পরান' বলে ডাকে, যা কিনা স্পষ্টতই প্রেমের ঘোষণা। রোমানের দিক থেকে সম্পর্কটা থাকে নিখাদ প্রেমের, অনন্যাকে বিরক্ত করায় এক ছেলের হাত পা ভেঙে দেয় সে। অনন্যা যখন এতে দুঃখ পেয়ে বলে, ওকে শাসন করলেই চলত, এত নির্মমভাবে মারার দরকার ছিল না, তখন রোমান বলে, 'তুই শুধু আমার'।

অনন্যার দিক থেকে প্রেম নয়, স্বার্থের সম্পর্ক হলেও সে একটা ফাঁদে পড়ে যায়। এক সময় রোমানের সাহায্যে এইচএসসি পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় সে। এত ফেলটুশ ছাত্রী কী করে একবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেল তার কোনো ব্যাখ্যা যদিও দেওয়া হয় নি। সে

যা-ই হোক, ইউনিভার্সিটিতে অনন্যার পরিচয় হয় সিফাতের সঙ্গে, সিফাত নরমশরম ভালো ছাত্র, নিজের সহপাঠীদেরও পড়ায় সাহায্য করে। অনন্যা সিফাতের প্রেমে পড়ে যায়। সে পড়াশোনায় সাহায্য চাইলে সিফাত সময় দিতে পারে না। তখন অনন্যা আবারও ব্যবহার করে রোমানকে। রোমান ভয় দেখিয়ে সিফাতকে রাজি করায় অনন্যাকে পড়াতে। পড়াতে আসতে আসতে দু'জনের প্রেম হয়ে যায়। সেই প্রেম প্রকাশ করে সিফাত চরম মার খায় রোমানের দলবলের কাছে, কিন্তু তার প্রেম অটুট থাকে। অনন্যা এই প্রেম রোমানের কাছে গোপন করে ও শর্ত জুড়ে দেয় রাজনীতি আর নেশা ছাড়তে হবে, তবেই সে রোমানের সঙ্গে সম্পর্কে থাকবে। রোমান রাজনীতি ছেড়ে দিতে চাইলে এলাকার মহিলা নেতা ডেইজি, যে কিনা গোপনে মাদক ব্যবসা চালায়, সে রোমানকে শায়েস্তা করতে তাকে নানা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। রোমান অনন্যাকে নিয়ে ঢাকায় পালিয়ে চলে যেতে চাইলে অনন্যা পালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রোমানকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। রোমান কারাগারে থাকার সুযোগে সিফাতকে বিয়ে করে ফেলে সে, সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেয় ছয় মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে বিদেশ চলে যেতে হবে। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে সিফাত বিয়েতেও রাজি হয় এবং জোরেশোরে পড়ালেখাও শুরু করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, অনন্যা রোমানকে দেখতে জেলখানায় গেলে রোমানের প্রেম দুর্বার হয়ে ওঠে, সে জেল থেকে পালিয়ে অনন্যার সঙ্গে দেখা করতে যায়। সিফাত সে সময় অনন্যার সাথে থাকায় দুইজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় ও এক পর্যায়ে পাশের ডাবওয়ালার দা নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় সিফাতকে কুপিয়ে হত্যা করে রোমান। অনন্যার নষ্টামি এখানেই শেষ হয় না, রোমানের এক চ্যালাকে ব্যবহার করে সে রোমানকে খুন করিয়ে সিফাত হত্যার প্রতিশোধ নেয়। এই ক্ষেত্রেও সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজের রূপ, যৌবন, যৌন আবেদন, লাস্য– নিজের নারীত্ব।

পাঠকের স্মৃতিশক্তি খারাপ না হলে মনে করতে পারবেন, নব্বই দশকের তুমুল জনপ্রিয় নাটক 'কোথাও কেউ নেই'-এর কথা। নাটকের মূল চরিত্র মুনা এবং বাকের। বাকের পাড়ার মাস্তান বলে তাকে 'বাকের ভাই' বলে ডাকা হতো। নাটকের শেষে এই বাকের ভাইয়ের ফাঁসি হয়ে যাবে এমনটা জানতে পেরে দর্শকদের একাংশ বেঁকে বসল। তাদের দাবি, নাটকের শেষটা পালটে দিতে হবে, বাকের ভাইয়ের ফাঁসি দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই নাটকের নাট্যকার, বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম লেখক হুমায়ূন আহমেদ অনড়, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না, বাকের ভাইয়ের ফাঁসি তিনি দিয়েই ছাড়লেন। এখানেই শেষ নয়, বদি, যে চরিত্র মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার বা রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে পর্দায় বাকেররূপী

আসাদুজ্জামান নূরের ফাঁসি হয়, সেই চরিত্রে রূপদানকারী শক্তিমান অভিনেতা আব্দুল কাদের একদিন শপিং মলে লাঞ্ছনার শিকার হন।

একে সম্ভবত হাইপাররিয়েলিটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। বাস্তব আর ফিকশনের সীমারেখা গুলিয়ে গেছে। জ্যাঁ বদ্রিয়ার এই হাইপাররিয়েলিটি থিওরি অনুযায়ী একটা সমাজ যখন প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক এগিয়ে যায় তখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আর বাস্তবের সীমারেখা গুলিয়ে যায়। আশির দশকে ফরাসি চিন্তাবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক বদ্রিয়া এই আলাপ তোলেন।

'পরান' সিনেমার আলাপের সাথে 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের হাইপাররিয়েলিটির সম্পর্ক কোথায়! সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও উদাহরণটা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের বাকের, মুনা, বদি, মজনু এই চরিত্রগুলো সরাসরি বাস্তব চরিত্র না হলেও এই সমাজ থেকেই নেওয়া। এই নাটকেও মস্তান বাকেরের শেষ পরিণতি করুণ হলেও হিরোইক। 'পরান' সিনেমাতেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটে। দর্শকের সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়ে পরান ওরফে রোমানের ওপর। সে সমাজবিরোধী হতে পারে, কিন্তু তার প্রেম দুর্বার। সে এক কথার মানুষ, অনন্যার শর্ত মেনে রাজনীতির পাণ্ডাগিরি ছেড়ে দেয়। নেশা ছাড়তে পারবে না বললেও শেষে অতি প্রিয় নেশাও ছেড়ে দেয়। হাজতে বা কারাগারে অনন্যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় সে শিশুর মতন কান্নাকাটি করে। ইয়াবার নেশা সম্পর্কে যারা জানেন তারাই কেবল বুঝতে পারবেন, রোমানের ওই শিশুসুলভ লাফঝাঁপ আসলে নেশার ডাউনফল।

তাত্ত্বিকরা যাকে বলে হেজেমনিক ম্যাসকুলিনিটি, রোমানের পারসোনালিটি ঠিক তাই। কিন্তু এই আধিপত্যবাদী পুরুষটিও বিয়ে হয়ে যাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতে এসে প্রেমিকার স্বামীর সঙ্গে শুরুতে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করে, সিফাত খারাপ ব্যবহার করার পরই কেবল সে নার্ভ হারিয়ে ক্ষেপে গিয়ে সিফাতকে হত্যা করে, যাকে বলা যায় হিট অব দ্য মোমেন্ট। ফলে তার অপরাধ অনেকটাই লঘু হয়।

অন্যদিকে সিফাতের পৌরুষকে দেখানো হয় উলটোরকমের, সে তার স্ত্রীকে বখাটেরা উত্ত্যক্ত করলেও শান্তিপূর্ণভাবে সরে যেতে চায়। এতে অনন্যার প্রতিক্রিয়া হয় বিরূপ। সে তার স্বামীকে যথেষ্ট পৌরুষিক নয় বলে মনে করে। স্ত্রীকে যে রক্ষা করতে পারে না সে কেমন পুরুষ! এক কথায় বললে সিফাতকে রোমানের উলটো করে দেখানো হয়। অবশ্য

আরো নানা পদের ম্যাসকুলিনিটিও রেফারেন্সের মতন করে এসেছে, যেমন রোমানের দলের আরেক সদস্য যে তোতলা, পুরো ছবিতে তাকে কমিক্যাল করে দেখালেও শেষে দেখা যায় অনন্যা তাকেও ব্যবহার করে রোমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। আরো আছেন অনন্যার অসহায় পিতা, কর্কশ কিন্তু সৎ পুলিশ অফিসার, মস্তানের ভয়ে ভীত শিক্ষক, এমন নানা পুরুষ চরিত্র। কিন্তু প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র পরস্পরের বিপরীত, যাকে বলে বাইনারি অপোজিশন।

এই ছবির পুরোটা জুড়েই রয়েছে সমাজনির্মিত নানারকম বস্তাপচা ধারণা। এই ধারণাগুলোর মধ্যে আছে নারী দুর্বল, খল, লোভী অথবা বোকা। উদাহরণ দিচ্ছি, প্রথম দৃশ্যে মৃত্যুশয্যায় থাকা অনন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসা পুলিশকে অনন্যার বাবা জিজ্ঞেস করেন, তার পরিবার আছে কি না, থেকে থাকলে কোনো কন্যাসন্তান আছে কি না! ন্যারেটিভ অ্যানালাইসিস করতে না বসলেও সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ক্রন্দন দিয়ে নারীর ভিকটিমহুড প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেল। উলেটোদিকে মূলধারার ফর্মুলা সিনেমার নিয়ম মেনে যখন একজন মহাপ্রতাপশালী ভিলেইন আমদানি করতে হলো, সেই ভিলেইন একজন নারী। কেউ প্রশ্ন করতে পারে আমাদের সমাজে কি খল নারী রাজনীতিবিদ নেই? তাদের কেউ কেউ কি গোপনে মাদক ব্যবসা চালান না? গুন্ডাপান্ডা পোষেন না? আমার কাছে তথ্য নেই, তবে তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি আছেন বা থাকতে পারেন। কিন্তু তাদের কয়জন ধূমপান করেন? খারাপ নারীরাই ধূমপান করেন এই ক্লিশের বাইরেও বের হতে পারেন নি এই নির্মাতা।

পুরো সিনেমায় রোমানের পরিবারের কোনো ক্লু নেই। অনন্যার মাকে দেখানো হয় বোকাসোকা ভালোমানুষ ধরনের, তার বোকামি কোথাও কোথাও কমিক লেভেলের। সিফাতের মা সর্বংসহা চিরাচরিত মা। আর অনন্যা হচ্ছে সব রকমের দোষে পরিপূর্ণ। সে বাবার কাছে মোবাইল ফোন চায়, প্রেমিকের কাছে চায় ফুচকা আর আইসক্রিম। স্বামীর কাছে করে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, দেশ এবং মাকে ছেড়ে তাকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর দাবি। তার কেবলই চাওয়া আর চাওয়া। এ ছাড়াও সে অত্যন্ত খারাপ ছাত্রী, মিথ্যেবাদী, বেয়াদব, ঘরের কোনো কাজ পারে না– মোট কথা সব দিক দিয়েই সে দোষী, নির্গুণ। তার একমাত্র গুণ আগুনের মতন রূপ আর লাস্য। তাই দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে রোমানের মতন নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার মতন বিশ্বাসঘাতক সে।

এইখানে আবারও ফিরে যেতে চাই 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের প্রসঙ্গে। পরান সিনেমায় যেমন রোমান ট্র্যাজিক হিরো হয়ে ওঠার সাথে সাথে অনন্যা হয়ে ওঠে খলনায়িকা; ওই নাটকের নায়িকা মুনার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে নি, যদিও সেখানেও কুত্তাওয়ালী বলে একজন মহিলা ভিলেইন থাকেন, যিনি অসহায় মেয়েদের নিয়ে যৌনকর্ম করান। কিন্তু প্রোটাগনিস্ট মুনাকে কেউ এই দোষে দোষী করে নি যে মুনা মামুনকে বিয়ে করতে চায় আবার বাকেরকেও হাতে রাখে। সেটা করা সম্ভব হয় নি কারণ মুনার চরিত্রকে আঁকা হয়েছে দৃঢ় করে। এই নাটকের অন্যান্য নারী চরিত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য। ফলে নাটকটিকে একপেশেভাবে নারীবিদ্বেষ প্রচারের দোষে দুষ্ট করা যায় না।

'কোথাও কেউ নেই' নাটক নিয়ে যা ঘটেছে, পরান সিনেমা নিয়ে ঘটেছে তার উলটো ঘটনা। নাটকের কাল্পনিক চরিত্ররা মূর্ত হয়ে বাস্তবে ঠাঁই করে নিয়েছে। পরানে বাস্তব কিছু চরিত্রকে কল্পনার প্রলেপ দিয়ে নির্মাতার ইচ্ছেমতো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই হাইপাররিয়েল সমাজে রোমান চরিত্রের মাধ্যমে নয়ন বন্ডকে একজন ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা গেল, অনন্যা চরিত্রের মাধ্যমে নারীকে বিশ্বাসঘাতিনী প্রমাণ করা গেল। বদ্রিয়ার তত্ত্বমতে ভার্চুয়াল আর রিয়েলের সীমারেখা গেল ভেঙে, কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পনা তালগোল পাকিয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে একটা মন্তব্য এমন শুনলাম, বাস্তবের মিন্নি সিনেমার অনন্যার চেয়েও খারাপ। হতে পারে মিন্নি বহুগামী নারী, কিন্তু অভিযুক্ত হিসেবে আইনজীবী পাওয়ার অধিকার সকল অপরাধীর রয়েছে। কিন্তু মিন্নি কোনো আইনজীবী পান নি। এই তথ্যটা মনে রাখবার মতন। সমাজে নারীবিদ্বেষ এমন প্রবলভাবে প্রোথিত যে প্রচুর ধর্ষণকারী আইনজীবী পেয়ে জামিনে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু হত্যার প্ররোচনার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন নারীর পাশে দাঁড়াতে কোনো আইনজীবী পাওয়া যায় না। আরো কিছু তথ্য এখানে যোগ করা প্রয়োজন। সিনেমার খুন হওয়া সিফাতের মতন বাস্তবের রিফাত নয়নের জাক্সটাপোজিশনে ছিলেন না, বরং তিনিও ছিলেন কিশোর গ্যাংয়েরই আরেক সদস্য এবং নয়নের বন্ধু। বাস্তবের মিন্নি ঠান্ডা মাথায় নিজের স্বামীর খুনীকে হত্যা করার জন্য আরেকজন বন্ধু বা শত্রুকে ব্যবহার করেন নি।

মিডিয়া বুমের এই যুগে সংবাদ মাধ্যম ও চলচ্চিত্র মাধ্যম মিলে নারীবিদ্বেষ প্রচারের যে মহান দায়িত্ব নিয়ে নিল তা একটা মনে রাখার মতন ঘটনা বলে মনে হওয়ায়ই এই লেখার সূত্রপাত। এখান থেকে বোঝা যায়, নারীবিদ্বেষ বিনোদন দেয় এবং নারীবিদ্বেষ জনপ্রিয়।

পুরো আলোচনায় সিনেমা একটা বড় অংশ জুড়ে থাকলেও সংবাদমাধ্যমও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই কোনোমতেই। এই ঘটনার ফলোআপ রিপোর্ট যত হয়েছে, অন্য সব অপরাধের ক্ষেত্রেও যদি হতো তাহলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই বিচার ও শাস্তি সম্ভব হতো। প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংস হত্যা নাকি নারী আসামি, কোনটা এই স্টোরির এত ফলোআপ করার ইন্ধন দিয়েছে তা নির্ণয় করা হয়ত কখনোই সম্ভব হবে না। কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে মব ট্রায়ালের একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে এই কেসের নিউজ ফলোআপ এবং এই সিনেমা। নারীর যৌনতা ও সৌন্দর্যের মতন নারীবিদ্বেষও বিক্রয়যোগ্য, এই কথাও হয়ত দাবি করা যায় পরান ছবির তুমুল জনপ্রিয়তা দেখে।

উম্মে রায়হানা গণমাধ্যমকর্মী। ummerayhana@gmail.com